بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ মার্চ, ২০২০ মোতাবেক ০৬ আমান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় হযরত মুসআব বিন উমায়ের এর স্মৃতিচারণ হয়েছিল, যার কিছু অংশ বাকি রয়ে যায়, যা আজ আমি বর্ণনা করব। হযরত মুসআব বিন উমায়ের সম্পর্কে, অর্থাৎ তাকে যে মদিনায় মুবাল্লেগ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে এবং তাঁর আবদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বারংবার এই সংবাদ দেয়া হচ্ছিল যে, তোমার হিজরতের সময় ঘনিয়ে আসছে। এছাড়া তাঁর (সা.) কাছে এটিও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর হিজরতের স্থান হলো এমন একটি শহর যেখানে কূপও রয়েছে আর খেজুরের বাগানও বিদ্যমান। প্রথমে তিনি (সা.) ইয়ামামা সম্পর্কে ধারণা করেন যে, হয়ত সেটি হিজরতের স্থান হবে। কিন্তু শিঘ্রই তাঁর (সা.) হৃদয় থেকে এই ধারণা বের করে দেয়া হয় আর তিনি (সা.) এই অপেক্ষায় থাকেন যে, খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে শহরই নির্ধারিত রয়েছে, তা নিজেকে ইসলামের নিরাপদ দুর্গ বানানোর জন্য উপস্থাপন করবে। ইতোমধ্যে হজ্জের মৌসুম চলে আসে। আরবের চতুর্দিক থেকে মানুষ মক্কায় হজ্জের জন্য সমবেত হতে আরম্ভ করে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ অভ্যাস অনুযায়ী যেখানেই কিতপয় ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখতেন, তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে তৌহীদের বাণী শোনানো আরম্ভ করতেন এবং ঐশী রাজত্বের সুসংবাদ প্রদান করতেন, অন্যায় ও পাপাচার এবং নৈরাজ্য ও দুষ্কৃতি পরিহার করার উপদেশ দিতেন। কেউ কেউ তাঁর কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে পৃথক হয়ে যেত। কেউ কেউ কথা শুনতে থাকলে মক্কার লোকেরা এসে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিত। আর এমন কতক, যারা পূর্বেই মক্কার লোকদের কথা শুনে রেখেছে, তারা ঠাট্টা করে তাঁর (সা.) কাছ থেকে সরে পড়ত। এমতাবস্থায় তিনি (সা.) মিনা উপত্যকায় ঘুরছিলেন, এমন সময় মদিনার অধিবাসী ছয়-সাত ব্যক্তির উপর তাঁর (সা.) দৃষ্টি পড়ে। তিনি (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কোন্ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেন? তারা উত্তরে বলে, খাযরাজ গোত্রের সাথে। তিনি (সা.) বলেন, সেই গোত্র যারা ইহুদীদের মিত্র? তারা বলে, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, আপনারা কি কিছুক্ষণ বসে আমার কথা শুনবেন? তারা যেহেতু তাঁর (সা.) কথা পূর্বেই শুনেছিল, আর তাদের হৃদয়ে তাঁর (সা.) দাবির বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল, তাই তারা তাঁর কথায় সম্মত হয় এবং তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে আরম্ভ করে। তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, ঐশী রাজত্ব সন্নিকটবর্তী। এখন মূর্তি বা প্রতিমা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। তৌহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। পুণ্য এবং তাকওয়া পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। মদিনার লোকেরা এই মহান নিয়ামতকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে কি? তারা তাঁর (সা.) কথা শুনে প্রভাবিত হয় এবং বলে, আপনার শিক্ষাকে আমরা গ্রহণ করছি। বাকি রইল এই কথা যে, মদিনাবাসী ইসলামকে আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কিনা? এর জন্য আমরা স্বদেশে ফিরে গিয়ে নিজ জাতির সাথে কথা বলব এবং পরবর্তী বছর আমাদের জাতির

সিদ্ধান্ত আপনাকে অবহিত করব। অতএব তারা ফিরে যায় এবং নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে তাঁর (সা.) শিক্ষার উল্লেখ করতে আরম্ভ করে। তখন মদিনায় দুটি আরব গোত্র অওস ও খাযরাজ, আর তিনটি ইহুদী গোত্র অর্থাৎ বনু কুরায়যা ও বনু নযীর এবং বনু কায়নুকা বসবাস করত। অওস এবং খাযরাজ ছিল পরস্পর বিবদমান। বনু কুরায়যা এবং বনু নযীর অওসের সাথে আর বনু কায়নুকা খাযরাজের সাথে মিত্রতা রাখতো। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর তাদের মাঝে এই চেতনাবোধ জাগ্রত হচ্ছিল যে, আমাদের পরস্পর সন্ধি করে নেয়া উচিত। অবশেষে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এটি নির্ধারিত হয় যে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল, যে খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিল, তাকে সকল মদিনাবাসী নিজেদের বাদশাহ্ হিসেবে মেনে নিবে। ইহুদিদের সাথে সম্পর্কের কল্যাণে অওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ শুনতো। ইহুদিরা যখন নিজেদের বিপদ এবং কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করত, তখন শেষে এটিও বলতো যে, মূসা'র মসীল বা সদৃশ একজন নবী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। তাঁর আসার সময় সন্নিকটে। তিনি আসলে আমরা পুনরায় পৃথিবীতে বিজয়ী হব। ইহুদিদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেয়া হবে। তাই সেই হাজীদের কাছে মদিনাবাসীরা যখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাবির কথা শুনে তখন তাঁর (সা.) সত্যতা তাদের হৃদয়ে ঘর করে নেয়; তারা বলে, তাঁকে তো সেই নবীই মনে হচ্ছে যার সংবাদ ইহুদিরা আমাদেরকে দিত। অতএব বহু যুবক এ কথা শুনে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষার সত্যতায় প্রভাবিত হয় আর ইহুদিদের কাছ থেকে শোনা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তাদের ঈমান আনয়নে সহায়ক হয়। অতএব পরবর্তী বছর হজ্জের সময় পুনরায় মদিনার লোকেরা আগমন করে। এবার বারোজন ব্যক্তি মদিনা থেকে এই সংকল্প নিয়ে বের হয় যে, তারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ধর্মে প্রবেশ করবে। তাদের মাঝে দশজন ছিল খাযরাজ গোত্রের আর দুইজন অওস গোত্রের। তারা মিনা'য় তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর (সা.)-এর হাতে এই কথার অঙ্গীকার করে যে, তারা খোদা ব্যতিরেকে অন্য কারো ইবাদত করবে না, চুরি করবে না, পাপাচরিতায় লিপ্ত হবে না, নিজেদের কন্যাসন্তানদের হত্যা করবে না, পরস্পরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না আর খোদার নবীর অন্যান্য পুণ্য শিক্ষায় তাঁর অবাধ্য হবে না।

তারা ফিরে গিয়ে স্বজাতির মাঝে আরো জোরালোভাবে তবলীগ করা আরম্ভ করে। মদিনার বাড়িঘর থেকে প্রতিমাগুলো বের করে বাহিরে নিক্ষেপ করা আরম্ভ হয়ে যায়। প্রতিমার সামনে যারা মাথা ঝুঁকাতো তারা এখন মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে আরম্ভ করে। এখন খোদা ব্যতিরেকে আর কারো সামনে মানুষের মাথা ঝুঁকার জন্য প্রস্তুত ছিল না। ইহুদিরা হতবাক ছিল যে, শতশত বছরের বন্ধুত্ব এবং শত শত বছরের তবলীগের মাধ্যমে যে পরিবর্তন তারা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে, ইসলাম ধর্ম মাত্র কয়েক দিনে সেই পরিবর্তন সৃষ্টি করে দেয়। তওহীদের বাণী মদিনাবাসীদের হৃদয়ে ঘর করে নিচ্ছিল। একের পর এক মানুষ আসতো আর মুসলমানদের বলতো, আমাদেরকে নিজেদের ধর্ম শিক্ষা দাও। কিন্তু মদিনার নওমুসলিমরা নিজেরাও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিল না আর শত-শত বরং হাজার-হাজার মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত বলার মতো জনবলও তাদের কাছে ছিল না। তাই তারা মক্কায় এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে এবং মুবাল্লিগ পাঠানোর আবেদন করে। তখন মহানবী (সা.) মুসআব নামের একজন সাহাবীকে, যিনি ইথিওপিয়ার হিজরত থেকে

ফিরে এসেছিলেন, মদিনায় ইসলামের তবলীগের জন্য প্রেরণ করেন। মুসআব (রা.) মক্কার বাহিরে প্রথম ইসলামী মুবাল্লিগ ছিলেন।

অপর এক স্থানে এই বিষয়েরই উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন যে,

মদিনাবাসীরা ইসলামের সংবাদ লাভ করে আর এক হজ্জের সময় মদিনার কিছু লোক মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে। তারা ফিরে গিয়ে স্বজাতির কাছে উল্লেখ করে যে, মদিনায় বসবাসকারী ইহুদিরা যে রসূলের আগমনের কথা উল্লেখ করত, তিনি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। এতে তাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় আর তারা পরবর্তী হজ্জে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করে তাঁর (সা.) কাছে প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে মতবিনিময়ের পর তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর হাতে বয়আত করে। তখন যেহেতু মক্কায় তাঁর (সা.) প্রচণ্ড বিরোধিতা হচ্ছিল তাই এক উপত্যকায় মক্কাবাসীদের দৃষ্টির আড়ালে এই সাক্ষাৎ হয় আর সেখানেই বয়আতও করা হয়। এ কারণে এটিকে আকাবার বয়আত বলা হয়। আকাবার অর্থ হলো দুর্গম গিরিপথ অথবা দুর্গম পাহাড়ী পথ। অতএব মহানবী (সা.) তাদেরকে মদিনার মু'মিনদের সংগঠনের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন আর ইসলাম প্রচারের নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্য নিজের একজন যুবক সাহাবী মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে প্রেরণ করেন, যেন তিনি সেখানকার মুসলমানদের ধর্ম শেখান। তারা (অর্থাৎ, মদিনা থেকে আগতরা) ফেরার প্রাক্কালে মহানবী (সা.)-কে এই নিমন্ত্রণও দিয়ে যায় যে, যদি মক্কা ত্যাগ করতে হয় তাহলে আপনি মদিনায় চলে আসুন। তাদের ফিরে যাবার অল্প সময়ের মাঝেই মদিনাবাসীদের মাঝে ইসলাম প্রসার লাভ করে এবং মহানবী (সা.) আরো কয়েকজন সাহাবীকে মদিনায় প্রেরণ করেন যাদের মাঝে হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন। এরপর হিজরতের নির্দেশ পাবার পর তিনি (সা.) নিজেও সেখানে চলে যান। আর তাঁর যাবার পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই সেই সমস্ত মদিনাবাসী, যারা মুশরিক ছিল, মুসলমান হয়ে যায়।

মদিনায় হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এবং হযরত আবু আইউব আনসারী (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন রচনা করেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধে মুহাজিরদের মূল পতাকা হযর মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র কাছে ছিল যা মহানবী (সা.) তাকে দিয়েছিলেন।

এছাড়া আরেকটি রেওয়ায়েত কিছুটা এরূপ, যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন যে,

উহুদের যুদ্ধেও মুহাজিরদের পতাকা হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র হাতে ছিল। মহানবী (সা.) ইসলামী সৈন্যবাহীনিকে সারিবদ্ধ করেন এবং বিভিন্ন দলের জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করেন। এ সময় তাঁকে এই সংবাদ দেয়া হয় যে, কুরাইশ বাহীনির পতাকা তালহার হাতে রয়েছে। তালহা সেই বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতো যা কুরাইশের পূর্বসূরি কুছাই বিন কেলাব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনার অধীনে বিভিন্ন যুদ্ধে কুরাইশদের পতাকা বহনের অধিকার রাখত। এটি অবগত হবার পর মহানবী (সা.) বলেন, আমরা জাতিগত বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের বেশি অধিকার রাখি, অতএব তিনি হযরত আলী (রা.)'র কাছ থেকে মুহাজেরদের পতাকা নিয়ে মুসআব বিন উমায়েরের হাতে তুলে দেন, যিনি সেই বংশেরই এক সদস্য ছিলেন যার সাথে তালহা সম্পর্ক রাখতো।

হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে লড়ছিলেন আর যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইবনে ক্বামেয়াহ্ তাকে শহীদ করেছিল। ইতিহাসে লেখা আছে যে, উহুদের যুদ্ধের পতাকাবাহী হযরত মুসআব বিন উমায়ের পতাকার সুরক্ষার দায়িত্ব যথার্থরূপে পালন করেছেন। উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত মুসআব (রা.) পতাকা বহন করছিলেন, এমতাবস্থায় অশ্বারোহী ইবনে ক্বামেয়াহ্ আক্রমণ হানে আর হযরত মুসআব (রা.) যে হাতে পতাকা বহন করছিলেন সে বাহু অর্থাৎ ডান বাহুতে তরবারির আঘাত করে তা কেটে ফেলে। তখন হযরত মুসআব (রা.) তখন এই আয়াত পড়েন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) এবং পতাকা বাম হাতে তুলে নেন। ইবনে ক্বামেয়াহ্ তখন বাম হাতের ওপর আঘাত করে তা-ও কেটে ফেলে। তখন তিনি উভয় বাহু দ্বারা ইসলামী পতাকাকে নিজের বক্ষে আঁকড়ে ধরেন। এরপর ইবনে ক্বামেয়াহ্ তৃতীয়বার বর্শার আক্রমণ হানে আর (তা) হযরত মুসআব (রা.)'র বক্ষে বিদ্ধ করে, বর্শা ভেঙে যায় (এবং) হযরত মুসআব (রা.) পড়ে যান। তখন বনু আব্দুদ্ দ্বার এর দু'ব্যক্তি সুয়ায়বাত বিন সা'দ বিন হারমালাহ্ ও আবু রূম বিন উমায়ের এগিয়ে আসেন এবং আবু রূম বিন উমায়ের পতাকা তুলে নেন আর তা মুসলমানদের মদিনায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তার কাছেই ছিল। শাহাদতের সময় হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র বয়স ছিল চল্লিশ বছর অথবা ততোধিক।

এ ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন– কুরাইশ বাহিনী প্রায় চারদিক থেকেই ঘিরে রেখেছিল এবং উপর্যুপুরী আক্রমণ করে ক্ষণে ক্ষণে মুসলমানদের উপর চাপ বৃদ্ধি করছিল। এ বাস্তবতার মুখেও মুসলমানরা হয়ত কিছুক্ষণ পরই আবার নিজেদেরকে সামলে নিত, কিন্তু তখন যে সর্বনাশ হয় তা হলো, কুরাইশদের এক বীর সৈনিক আব্দুল্লাহ্ বিন ক্বামেয়াহ্ মুসলমানদের পতাকাবাহী হযরত মুসআব বিন উমায়েরের ওপর আক্রমণ করে এবং নিজ তরবারির আঘাতে তার ডান হাত কেটে ফেলে। হযরত মুসআব তৎক্ষণাৎ অপর হাতে পতাকা উঠিয়ে নেন এবং ইবনে ক্বামেয়াহ্ সাথে লড়াই করার জন্য সামনে এগিয়ে যান, কিন্তু সে অপর এক আঘাতে তার দ্বিতীয় হাতও কেটে ফেলে। এতে হযরত মুসআব (রা.) তাঁর কর্তিত উভয় হাত এক করে ইসলামের পতনোম্মুখ পতাকা ধরে রাখার চেষ্টা করেন এবং তা নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। এরপর ইবনে ক্বামেয়াহ্ তাঁর ওপর তৃতীয় আঘাত হানলে হযরত মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে যান। পতাকা যদিও অন্য একজন মুসলমান তৎক্ষণাৎ সামনে এগিয়ে এসে হাতে তুলে নিয়েছিলেন কিন্তু হযরত মুসআব (রা.)-এর গড়ন গঠন যেহেতু অনেকটা মহানবী (সা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল তাই ইবনে ক্বামেয়াহ্ ভাবলো যে, সে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছে। অথবা এটিও হতে পারে যে, শুধুমাত্র দুষ্কৃতি ও প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে সে এ কথা ছড়িয়েছে। যাহোক, হযরত মুসআব (রা.) শহীদ হয়ে পড়ে যাওয়ার পর সে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি। এ সংবাদ শুনে মুসলমানদের অবশিষ্ট উদ্যমটুকু হারিয়ে যেতে থাকে এবং তাদের বাহিনী পুরোপুরি বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের হতোদ্যম হওয়ার এটিও একটি বড় কারণ ছিল। কিন্তু যাহোক, পরবর্তীতে তারা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন হযরত মুসআব (রা.)-এর লাশের কাছে পৌঁছেন তখন তার লাশ উপুর হয়ে পড়ে ছিল। মহানবী (সা.) তার পাশে দাঁড়িয়ে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন-

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

(সূরা আহযাবঃ ২৪)

অর্থাৎ, মু'মিনদের মাঝে এমন সুপুরুষও আছে, যারা আল্লাহর সাথে যে বিষয়ে অঙ্গীকার করেছিল, তা পূর্ণ করে দেখিয়েছে। অতএব তাদের মাঝে এমনও আছে যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে আর তাদের মাঝে এমনও আছে যারা এখনও অপেক্ষা করছে এবং তারা নিজেদের কর্মপন্থায় কখনোই কোন পরিবর্তন করে নি। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, **ইন্না রাসূলাল্লাহি ইয়াশহাদু আন্নাকুমুশ্ শুহাদাউ ইনদাল্লাহি ইয়াওমাল কিয়ামাতি।** অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসূল সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তোমরা কিয়ামত দিবসেও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শহীদ। এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তার যিয়ারত করে নাও বা তাকে দেখে নাও এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যে-ই তাকে সালাম করবে তিনি তার সালামের উত্তর দিবেন। হযরত মুসআব (রা.)-এর ভাই হযরত আবু রোম বিন উমায়ের, হযরত সোয়ায়বাত বিন সা'দ এবং হযরত আমের বিন রাবীআ হযরত মুসআব (রা.)-কে কবরে নামান। সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

উহুদের শহীদদের মাঝে অন্যতম ছিলেন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)। তিনি মদিনায় ইসলামের মুবাল্লেগ হিসাবে আগমনকারী সর্বপ্রথম মুহাজের ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে মক্কার যুবকদের মাঝে মুসআবকে সবচেয়ে বেশি কেতাদুরুস্ত ও অভিজাত মনে করা হতো আর তিনি খুবই আভিজাত্যের মাঝে বাস করতেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) একবার তার দেহে একটি কাপড় দেখেন যাতে অনেক জোড়া-তালি লাগানো ছিল, তখন তাঁর স্মৃতিপটে হযরত মুসআবে পূর্বেকার যুগের চিত্র ভেসে উঠে যার ফলে তাঁর দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠে। উহুদের যুদ্ধে হযরত মুসআব (রা.) যখন শহীদ হন তখন তার পরনে এতটুকু কাপড়ও ছিল না যা দিয়ে তার দেহ ঢাকা সম্ভব হতো। পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যেত আর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যেত। তাই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকার পর পা ঘাস দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

সহীহ্ বুখারীতে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-রোযাদার ছিলেন। তার সামনে ইফতারের সময় খাবার আনা হলে তিনি বলেন, মুসআব বিন উমায়ের (রা.) শহীদ হয়েছেন। তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তাকে একটি মাত্র কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মাথা আবৃত করলে তার পা অনাবৃত হয়ে যেত আর পা আবৃত করলে তার মাথা অনাবৃত হয়ে পড়ত। বর্ণনাকরী বলেন, আমার মনে হয় (তিনি) এটিও বলে থাকবেন যে, হামযা (রা.) শহীদ হয়েছেন, আর তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। এরপর তিনি বলেন, আমরা জাগতিক সেসব স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছি যা চোখের সামনে রয়েছে। অথবা এভাবে বলেছেন যে, আমাদেরকে জাগতিক সেসব জিনিস দেয়া হয়েছে যা দেখতে পাচ্ছ আর আমার ভয় হয়, কোথাও আমরা আমাদের পুণ্যের প্রতিদান খুব দ্রুতই প্রাপ্ত হইনি তো! এরপর তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন, এমনকি তিনি খাওয়া পরিত্যাগ করেন। আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি এবং পরজগতে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার তার সামনে এসে যায়, যে কারণে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। অর্থাৎ আমরা এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছি যে, এ

জগতেই আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুরো প্রতিদান দিয়ে দেন নি তো এবং এমন যেন না হয় যে, পরপারে গিয়ে আমরা আর কিছুই পাব না।

হযরত খুব্বাব বিন আর্‌ত (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে দেশত্যাগ করি, আমরা কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী ছিলাম আর আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার দায়িত্বে ছিল। আমাদের মাঝে এমন লোকও আছে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আর তারা তাদের প্রতিদান থেকে কিছুই ভোগ করে নি। তাদেরই একজন হলেন, হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এবং আমাদের মাঝে এমন লোকও আছে যাদের ফল পরিপক্ক হয়েছে আর তারা সেই ফল ভোগ করছে। হযরত মুসআব (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন আর তাকে কাফন দেয়ার মতো কেবল একটি চাদরই আমরা পেয়েছিলাম। আমরা যখন সেটি দিয়ে তার মাথা আবৃত করতাম তখন তার পা অনাবৃত হয়ে পড়ত আর আমরা যদি তার পা আবৃত করতাম তাহলে তার মাথা অনাবৃত হয়ে পড়ত। তখন মহানবী (সা.) আমাদের বলেন, আমরা যেন তার মাথা ঢেকে দেই এবং তার পায়ের ওপর ইযখার ঘাস দিয়ে দেই।

তিরমিযী শরীফের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ্ তা'লা সাতজন করে সম্ভ্রান্ত সাথি দান করেছেন অথবা বলেছেন, নেতা দান করেছেন, কিন্তু আমাকে দেয়া হয়েছে চৌদ্দজন। তখন আমরা নিবেদন করলাম, তারা কারা? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমার দুই দৌহিত্র জা'ফর ও হামযা, আবু বকর, উমর, মুসআব বিন উমায়ের, বিলাল, সালমান, মিক্বদাদ, আবু যর, আম্মার এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ।

হযরত আমের বিন রাবিয়া (রা.) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলতেন– হযরত মুসআব বিন উমায়ে (রা.) যখন ঈমান আনয়ন করেন, তখন থেকে নিয়ে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত তিনি আমার বন্ধু ও সাথি ছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ার উভয় হিজরতে আমার সাথে গিয়েছেন। মুহাজেরদের মাঝে তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমি এমন কোন মানুষ দেখি নি যে তার চেয়ে অধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং যার সাথে তার চেয়ে কম মতবিরোধ হবে

উহুদের যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদিনায় ফিরে আসলে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর স্ত্রী হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন মানুষ তাকে তার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ দেয়, এতে তিনি إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়েন এবং তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন। এরপর মানুষ তাকে তার মামা হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ দেয়, তখন তিনি إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়েন এবং তার ক্ষমার জন্য দোয়া করেন। পুনরায় মানুষ তাকে তার স্বামী হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর শাহাদাত সম্পর্কে অবগত করে, তখন তিনি কেঁদে উঠেন এবং অস্থির হয়ে পড়েন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, স্ত্রীর হৃদয়ে তার স্বামীর এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা থাকে।

অপর এক বর্ণনায় হযরত হামনা বিনতে জাহাশ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যখন তাকে বলা হয় যে, তোমার ভাইকে শহীদ করা হয়েছে, তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি কৃপা করুন এবং আরও বলেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মানুষ বলল, তোমার স্বামীকেও শহীদ করা হয়েছে। তখন তিনি বলেন, হায় আফসোস! তার কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন,

মহিলাদের সাথে তাদের স্বামীর এমন এক সম্পর্ক থাকে, যা অন্য কারো সাথে হয় না। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তার এক খুতবায় এই ঘটনাটি নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন যাতে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা এবং তাঁর শাহাদাতে তাঁর স্ত্রীর যে প্রতিক্রিয়া ছিল, তা উল্লেখ করেছেন। তিনি (রাহে.) এভাবে বলেন যে,

সেইসব পুরুষ ও মহিলা সাহাবী, যাদের আত্মীয়ের সংখ্যা একাধিক হতো, তাদেরকে তিনি (সা.) ধীরেধীরে এমনভাবে সংবাদ দিতেন যেন দুঃখ তাদের হৃদয়কে আকস্মিকভাবে পরাভূত না করে বসে। অতএব যখন হুযূর (সা.)-এর কাছে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র বোন হামনা বিনতে জাহাশ উপস্থিত হলেন তখন তিনি (সা.) বলেন, হে হামনা! তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পুণ্যের আশা রাখ। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কার পুণ্যের? তিনি (সা.) বলেন, তোমার মামা হামযা'র। তখন হযরত হামনা বলেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, **গাফারা লাহু ওয়া রাহেমাহু হানিয়ান লাহু শাহাদাহ**। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি দয়া করুন এবং তার শাহাদাত তার জন্য সুখকর করে দিন)। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে হামনা! ধৈর্য্য ধারণ কর, আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পুণ্যের আশা রাখ। তিনি বলেন, এটি কার পুণ্যের কথা বলছেন? তিনি (সা.) বলেন, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ্‌র। তখন হযরত হামনা পুনরায় বলেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, **গাফারালাহু ওয়া রাহেমাহু হানিয়ান লাহু শাহাদাহ** (আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি দয়া করুন এবং তার শাহাদাত তার জন্য সুখকর করে দিন)। এরপর পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, হে হামনা! ধৈর্য্য ধারণ কর, আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিদানের আশা রাখ। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি কার জন্য? মহানবী (সা.) বলেন, মুসআব বিন উমায়ের এর জন্য। তখন হযরত হামনা বলেন, হায় পরিতাপ। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, সত্যিই স্ত্রীর ওপর স্বামীর বেশ বড় অধিকার রয়েছে যা অন্য কারো নেই, আর তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এমন কথা কেন বললে? তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তার সন্তানদের এতিম হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমার স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়ে উঠে, যার ফলে আমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম আর বিচলিত অবস্থায় আমার মুখ থেকে এমন কথা বের হয়েছে। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) মুসআব (রা.)-এর সন্তানদের জন্য এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তাদের অভিভাবক ও জ্যোষ্ঠরা তাদের প্রতি স্নেহ ও দয়ার আচরণ করবে এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে; তোমার কাছে এটিই আমার মিনতি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি সত্যিই অনুগ্রহের আচরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর দোয়া গৃহীত হয়। এখানে হযরত মুসআবের স্মৃতিচারণ সমাপ্ত হলো; ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে পরবর্তী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে।

এখন আমি বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে যে মহামারী বিস্তৃত হয়ে আছে সে বিষয়ে জামা'তের বন্ধুদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। যেমনটি বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে, আমাদের সবার সেসব সতকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। একেবারে প্রথমদিকে হোমিও ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে আমি কয়েকটি হোমিও ঔষধের কথা বলেছিলাম যেগুলো সাবধানতামূলকভাবে ব্যবহারের জন্যও এবং কিছু চিকিৎসা স্বরূপও। সেগুলো ব্যবহার করা উচিত, এগুলো সম্ভাব্য চিকিৎসা মাত্র। আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, এটি শতভাগ কার্যকর চিকিৎসাপত্র অথবা সেই ভাইরাস সম্পর্কে

হোমিও চিকিৎসকরা পুরোপুরি অবগত। এটি এমন এক ভাইরাস, যার সঠিক জ্ঞানই নেই, কিন্তু এই ধরনের রোগের সর্বসম্ভাব্য যে চিকিৎসা হতে পারে তা সামনে রেখে সেই ঔষধগুলো প্রস্তাব করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সেগুলোর মাঝে নিরাময়ী বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করুন, তাই এগুলো ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু এর পাশাপাশি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণও আবশ্যক যেমন কি-না ঘোষণা করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আবশ্যকীয় বিষয় হলো জমায়েত এড়িয়ে চলা। মসজিদে আগমনকারীদেরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যদি সামান্য জ্বরও থাকে, শরীরে ব্যাথা-বেদনা থাকে অথবা হাঁচিকাশি কিংবা সর্দি থাকে তাহলে মসজিদে আসা উচিত নয়। মসজিদেরও কিছু অধিকার রয়েছে। মসজিদের একটি অধিকার হলো সেখানে যেন এমন কোন ব্যক্তি না আসে যার কারণে অন্যরা প্রভাবিত হতে পারে। যে কোন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মসজিদে আসার ব্যাপারে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। সাধারণ অবস্থায়ও হাঁচি দেয়ার সময় সবার উচিত মুখে হাত কিংবা রুমাল দেয়া, বর্তমানে বিশেষ করে (তা করা উচিত)। কতক নামাযীও অভিযোগ করে থাকে যে, কিছু কিছু লোক আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাঁচি দেয় অথচ তারা মুখের সামনে হাত কিংবা রুমাল কিছুই রাখে না। আবার হাঁচি এত উঁচু হয়ে থাকে যে, আমাদের গায়েও থুতুর ছিটেফোঁটা এসে পড়ে। অতএব পাশে দাঁড়ানো নামাযীদের এটি একটি অধিকার। তাই সবার এ বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। আমি যেমনটি বলেছি, বর্তমানে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ডাক্তাররা বর্তমানে যে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলছেন তা হলো, হাত এবং মুখমণ্ডল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। হাত নোংরা থাকলে মুখমণ্ডলে হাত দিবেন না। হাতে স্যানিটাইযার বা জীবাণুনাশক লোশন লাগিয়ে রাখুন কিংবা বার বার ধৌত করুন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেউ যদি পাঁচ বেলার নামাযে অভ্যস্ত হয়, আর পাঁচ বেলা রীতিমতো ওযূ করে, নাকে পানি দেয়, যার মাধ্যমে নাক পরিষ্কার হয় এবং সঠিকভাবে ওযূ করা হয় তাহলে এটি পরিচ্ছন্নতার এমন এক উন্নত মান যা স্যানিটাইযার এর ঘাটতি পূরণ করবে। শোনা যাচ্ছে, বর্তমানে বাজারে স্যানিটাইযার শেষ হয়ে গেছে। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে সবকিছু কিনে নিয়েছে, দোকানের তাক খালি, বিশেষত এমনসব জিনিস যা এই কাজে ব্যবহার হতে পারে। যাহোক সঠিকভাবে যদি ওযূ করা হয় তাহলে তা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতাও বটে, আর যে ব্যক্তি ওযূ করবে সে নামাযও পড়বে। ফলে এটি আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতারও সর্বোত্তম মাধ্যম সাব্যস্ত হয়। এছাড়া বর্তমানে দোয়া করারও অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। তাই আমাদের এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া উচিত। আমি মসজিদের অধিকারের কথা উল্লেখ করেছি, তাই এটাও বলে দিচ্ছি যে, যারা মসজিদে মোজা পরে আসেন- সাধারণ সময়েও আর বিশেষত শীতের সময়েও, প্রত্যেক দিনই মোজা পরিবর্তন করা উচিত এবং ধোয়া উচিত। যদি মোজা থেকে বা পা থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকে তাহলে সাথে দাঁড়ানো নামাযীদের জন্য এটি কষ্টের কারণ হয়ে থাকে, কিংবা পিছনের সারিতে যে নামাযী সিজদা করছেন তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। তাই এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। মহানবী (সা.) তো এই নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, কোন গন্ধযুক্ত জিনিস, যেমন পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে আসবে না। এতে কখনো কখনো ঢেঁকুর ইত্যাদি ওঠে বা এমনিতেই মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে, যা নামাযীদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। এটি নামাযীদের জন্য এবং মসজিদের পরিবেশের জন্যও কষ্টদায়ক পরিস্থিতির অবতারণা করে। বরং এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মসজিদে এলে সুগন্ধি লাগিয়ে এসো; বরং এতটা সাবধানতার শিক্ষা রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন,

কাঁচা মাংস নিয়ে মসজিদের ভেতর দিয়ে হেঁটেও যেও না, সেখানে কেউ (দুর্গন্ধ নিয়ে) বসে থাকা তো দূরের কথা। সুতরাং শরীরের পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশের পরিচ্ছন্নতাও একজন নামাযীর জন্য নিতান্ত আবশ্যক, এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। কিন্তু এর অর্থ এটিও নয় যে, এই ছুতোয় মসজিদে আসা ছেড়ে দিবেন। নিজের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজ হৃদয়ের কাছ থেকে ফতোয়া নেয়া উচিত। সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়ের অবস্থা জানেন। তাই যদি কোন অসুস্থতা থাকে, তাহলে ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন যে, এটি কোন্ ধরনের অসুস্থতা। তবে দু'একদিন (মসজিদ) এড়িয়ে চলাও উত্তম। এছাড়া আজকাল এটাও বলা হচ্ছে যে, করমর্দন এড়িয়ে চলুন– এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; বলা যায় না কার হাত কেমন! তাই যদিও করমর্দনের ফলে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই রোগের কারণে আজকাল এটি এড়িয়ে চলাই উত্তম। জগৎপূজারীরা, যারা হৈচৈ করত যে, মুসলামনরা করমর্দন করে না, (পুরুষরা) নারীদের সাথে করমর্দন করে না, (নারীরা) পুরুষদের সাথে করমর্দন করে না– তাদেরকে নিয়েই এখন কৌতুক তৈরি হচ্ছে। জার্মানীর চ্যান্সেলরের সাথে তার মন্ত্রী করমর্দন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে আর এ সংক্রান্ত একটি কৌতুক তৈরি হয়েছে। এখানেও একজন সংসদ সদস্য বলেছেন, আমরা যে আজকাল করোনা ভাইরাসের কারণে করমর্দন এড়িয়ে চলছি তা অত্যন্ত ভালো, কেননা করমর্দন করা আমাদের সংস্কৃতি নয়। আমাদের সংস্কৃতি হলো পূর্বে আমরা স্যালুট করতাম অথবা মাথা থেকে হ্যাট খুলে ঝুঁকতাম। এখন এই সংস্কৃতি বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এছাড়া সে এটি পর্যন্ত বলেছে যে, আমরা নারীদের সাথে করমর্দন করি; বরং আলিঙ্গন করে চুম্বনের চেষ্টা করি অথচ আমরা এটা জানিও না যে, নারীরা এটি আদৌ পছন্দ করে কিনা। আর জোরপূর্বক আমরা এসব কর্মকাণ্ড করছি। এরা আল্লাহ্ তা'লার কথা মানার জন্য তো প্রস্তুত ছিল না কিন্তু এই রোগ এবং এ মহামারি কমপক্ষে এদিকে তাদেরকে মনোযোগী করেছে। আল্লাহ্ তা'লা করুন খোদা তা'লার দিকেও যেন তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মানার ব্যাপারে তাদের মতবিরোধ ছিল; যখন আমরা বলতাম আর খুবই ভালোবাসার সাথে বলতাম যে, আমাদের এভাবে সালাম করা নিষেধ বা পুরুষ মহিলার করমর্দন করা নিষিদ্ধ। সে সম্পর্কে তারা অনেক হৈচৈ করত। কিন্তু এখন প্রায়ই শোনা যায়, বিভিন্ন বিভাগে বা দপ্তরে এবং বিভিন্ন স্থানে এরা যারা অস্বীকার করে, অত্যন্ত রুঢ়ভাবে তা করে। আমরা তো অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে এবং নম্রতার সাথে বলতাম যে, এটি আমাদের শিক্ষা। কিন্তু এখন এই করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে তারা এতটাই সতর্ক হয়ে গেছে যে, সেখানে চারিত্রিক মূল্যবোধের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করে না। যাহোক এই মহামারি এদিক থেকে তাদের কিছুটা সংশোধন করেছে। আর আমি যেমনটি বলেছি, এই সংশোধন যেন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, এই মহামারি আর কতটা বিস্তৃত হবে এবং কোন পর্যায়ে যাবে আর আল্লাহ্ তা'লার তকদীর কী। কিন্তু যদি এই রোগ আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণে প্রকাশ পেয়ে থাকে যেমনটি এ যুগে আমরা দেখছি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের মহামারি, রোগ, ভূমিকম্প, ঝড় ইত্যাদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে; এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার তকদীরের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহতা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যেক আহমদীর এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে দোয়ার প্রতিও মনোনিবেশ করা উচিত এবং নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়নের প্রতিও মনোযোগ

নিবদ্ধ করা উচিত। অপর দিকে পৃথিবীর জন্যও দোয়া করা উচিত; আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও হেদায়েত দিন, আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে সামর্থ্য দিন যেন তারা পার্থিবতায় অতিমাত্রায় নিমজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে এবং খোদা তা'লাকে ভুলে যাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা খোদাকে শনাক্তকারী হয়।

এরপর আমি কয়েকজনের গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা হলো আকিল আহমদ বাট সাহেবের পুত্র স্নেহের তানযিল আহমদ বাট এর। সে এগারো বছরের ছোট এক বালক ছিল। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু তো নয় বরং আমার মতে এটি শাহাদাত। তানযীল আহমদ বাট-এর মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনা হলো- লাহোরের দিল্লী গেইটস্থ শাহ্দারা কলোনিতে তাকে তার প্রতিবেশী নারী ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৌলভীদের ফতোয়া আহমদীদেরকে যে কোন অজুহাতে হত্যা করা পাকিস্তানে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছে। এ হত্যাকাণ্ডও এরই ফলশ্রুতি। আর এ দিক থেকে আমি এই শিশুকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করি। কারণ যা-ই হোক, কিন্তু এর পেছনে আহমদীয়াতের প্রতি যে বিদ্বেষ রয়েছে সেটিও একটি কারণ। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সে নিষ্পাপ শিশু ছিল, তার কোন অপরাধ ছিল না। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো স্নেহের তানযীল আহমদ বাটের মা ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাকে প্রতিবেশীদের ঘর থেকে নিজের ছোট বোনের পুতুল আনার জন্য পাঠান, যা সে সেখানে ফেলে এসেছিল। সেই বাড়িতে তার যাতায়াতও ছিল। এই ঘটনার আসল কারণ কী, তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। ঘটনার এক দিন আগে সেখানে পুতুল রেখে এসেছিল; মা তাকে পাঠিয়েছেন গিয়ে পুতুল নিয়ে আসার জন্য। দীর্ঘ অপেক্ষার পরও যখন ছেলে ফিরে আসে নি তখন মা নিজে প্রতিবেশীর বাড়ি যান। প্রতিবেশী মহিলা প্রথমে দরজা খুলে নি। দীর্ঘক্ষণ পরে দরজা খুললে তার কাছে ছেলে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে যে, সে পুতুল নিয়ে ফিরে গেছে। এতে স্নেহের তানযিলের মা তার স্বামী আকিল সাহেবকে সংবাদ দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে মিলে ছেলেকে খুঁজতে আরম্ভ করেন এবং পুলিশের কাছেও রিপোর্ট করেন। এরপর যখন গলির সিসি টিভি ক্যামেরা পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন ছেলেটিকে প্রতিবেশীর বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখা গেছে ঠিকই কিন্তু এরপর সে আর বের হয়নি। তখন পুলিশের সহায়তায় বাড়ি তল্লাশি করা হলে একটি ট্রাঙ্ক থেকে উক্ত শিশুর লাশ উদ্ধার হয়। তখন পুলিশ বলে, সেই ঘাতক মহিলার স্বামী পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, তার স্ত্রী ছেলেটিকে হত্যা করে লাশ ট্রাঙ্কে লুকিয়ে রেখেছে। সেই মহিলা বাড়ির মালিকের ছেলের সাথে মিলে শিশুটিকে হত্যা করেছিল; যা এখন সে স্বীকারও করেছে। স্নেহের তানযিল আহমদ বাট ২০০৯ সালের ২০ নভেম্বর তারিখে লাহোরে জন্ম গ্রহণ করে। সে ওয়াকফে নও তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত ছিল; আতফালুল আহমদীয়া সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিল, নিয়মিত জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিত। নিজ ক্লাসে মেধাবী ছাত্রদের মাঝে পরিগণিত হতো। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল; মৃত্যুর পর যখন তার পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়, তা থেকে জানা যায় যে, সে ৭৫০ নম্বর থেকে ৭২৯ নম্বর পেয়ে ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। স্নেহের তানযিলের মা বলেন, আমার সন্তানদের মধ্যে তানযিল সবচেয়ে বেশি অনুগত ছিল; যে কোন কাজ করার আগে আমার কাছে অনুমতি নিয়ে করত। কোন প্রতিবেশী বা কোন কর্মকর্তাও তাকে কোন কাজের কথা বললে সে তৎক্ষণাৎ কাজ করে দিত; কখনোই অস্বীকার করত না। এমনকি সেই ঘাতক প্রতিবেশী মহিলাও তাকে দিয়ে কখনো কখনো কাজ করাত এবং সে

সবসময় তার আনুগত্য করত, তার কাজে সাহায্য করত। স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী ও জামা'তের কর্মকর্তারাও তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিল। তারা সবসময় তার প্রশংসা করতেন। সে এমটিএ'র অনুষ্ঠানাদির নিয়মিত দর্শক ছিল; বিশেষ করে শিশুদের অনুষ্ঠান এবং খুতবা ইত্যাদি শুনতো। মসজিদে নিয়মিত নামায পড়তে যেত। তার বাবা কারখানা থেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফিরে যদি মসজিদে যেতে কখনো সামান্য আলসেমী দেখাতেন তাহলে স্নেহের তানযিল তাকে জোর করে মসজিদে নিয়ে যেত। স্নেহের মরহুম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তার পেছনে পিতা আকিল আহমদ বাট, মা নায়েলা আকিল এবং চার ভাই-বোন রেখে গেছে অর্থাৎ দুই ভাই ও দুই বোন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তাঁর প্রিয়দের মাঝে স্থান দিন আর হত্যাকারীদের কৃতকর্মের শাস্তি দিন এবং তাঁর পিতামাতাকে ধৈর্য্য ও প্রশান্তি দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো ডাক্তার মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র রাওয়ালপিণ্ডি জেলার সাবেক আমীর ব্রিগেডিয়ার বশীর আহমদ সাহেবের। তিনি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি তাঁর পেছনে পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁর স্ত্রী ছাড়া দুই পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। ব্রিগেডিয়ার বশীর আহমদ সাহেব ১৯৩১ সালে গুজরাত জেলার একটি একান্ত নিষ্ঠাবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ডাক্তার মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব নিজে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। ব্রিগেডিয়ার সাহেব কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের মিলিটারি একাডেমির Six Long Course-এ পাকিস্তান-সেনাবাহিনীতে তিনি কমিশন গ্রহণ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি ব্রিগেডিয়ার হিসেবে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর দীর্ঘদিন তিনি ইসলামাবাদের পলিসি ইন্সটিটিউটের প্রধান হিসেবে দেশের সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। এভাবে তিনি ৬৬ বছর যাবৎ দেশসেবার সুযোগ লাভ করেন।

ব্রিগেডিয়ার সাহেবের জামা'তী সেবা হলো, ২০১২ সালে তাকে আমি রাওয়ালপিণ্ডি জামা'তের আমীর নিযুক্ত করেছিলাম আর ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত তিনি রাওয়ালপিণ্ডি শহর এবং জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে তার বদলি হয়। ১৬ বছর পর্যন্ত তিনি রাওয়ালপিণ্ডি জামা'তের শহর ও জেলার নায়েব আমীর এবং সেক্রেটারী তালীম হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টর এবং মজলিসে শূরার বিভিন্ন কমিটিরও তিনি সদস্য ছিলেন। মরহুম ব্রিগেডিয়ার সাহেব অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন আর আন্তরিকতার সাথে জামা'তের সেবা করতেন। তিনি মিশুক ও স্নেহশীল আর সৃষ্টির সেবাকারী ও অসহায়দের কাজ আন্তরিকতার সাথে করতেন। ধর্মের কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নীতিবান এবং সময়ানুবর্তী ছিলেন। নিজেও দ্রুতগতিতে জামা'তের কাজ করতেন এবং নিজের সাথীদেরও এর জন্য উপদেশ দিতেন। ধর্মের কাজে অলসতা সহ্য করতেন না, বরং কোন কাজের ক্ষেত্রেই নয়। নিজ আমেলার সদস্যদেরকে তিনি যে কাজ দিতেন, নির্দিষ্ট সময়ে সে কাজের ফলোআপ অবশ্যই করতেন। গভীর দোয়াগো, ইবাদতগুযার আর খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী নিবেদিতপ্রাণ মানুষ ছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তার স্মরণ শক্তিও বেশ প্রখর ছিল। মহানবী (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ছিলেন আর সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন যে, তিনি আহমদী। পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক সব সময় তার

মাথার পাশে থাকত। তার পড়াশোনার গণ্ডি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। দরিদ্র ও অভাবীদেরকে উদারভাবে ও নীরবে আর্থিক সাহায্য করতেন, বিশেষত বিধবাদের অভাব মোচনে অত্যধিক সচেতন থাকতেন আর সর্বদা তাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। বহু ব্যক্তি ও পরিবার তার স্থায়ী আর্থিক সাহায্য থেকে উপকৃত হচ্ছিল। আর সাহায্যও এত বেশি করতেন যে, এক ব্যক্তি এটিও লিখেছে যে, তার দোকান পুড়ে যাওয়ার কারণে অনেক ক্ষতি হয়। তিনি নীরবে মানুষের অজান্তে আমাকে কিছু টাকা প্রদান করেন এবং বলেন পরবর্তীতে কখনো এর উল্লেখ করবে না। ঘরে গিয়ে সে তা খুলে দেখে তাতে দুই লক্ষ টাকা ছিল। যখন তার ব্যবসার উন্নতি হয় আর সে উক্ত অর্থ ফেরত দিতে যায় তখন তিনি বলেন, আমি ফেরত নেয়ার জন্য তা দেই নি।

রাওয়ালপিণ্ডি জেলার মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব তাহের মাহমুদ সাহেব লিখেন, আমীর সাহেব অত্যন্ত শান্তশিষ্ট প্রকৃতির, দয়াদ্র, স্বল্পভাষী এবং অত্যন্ত দোয়াগো মানুষ ছিলেন। জুমুআর দিন জুমআর নামাযের অনেক পূর্বেই তিনি এওয়ানে তওহীদে চলে আসতেন আর অত্যন্ত বিনয় ও আকুতি-মিনতির সাথে নফল আদায় করতেন। দ্রুত নামায আদায়কারীদের তিনি কাদিয়ানের সাহাবী ও বুযুর্গদের ঘটনা শোনাতেন, যেখানে তিনি তরবিয়ত লাভ করেছিলেন। ধীরে ধীরে নামায আদায়কারীদের প্রতি তিনি সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ করতেন। প্রচলিত দোয়াসমূহ এবং তাসবীহ্ ইত্যাদির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তিনি নিজেও দোয়াকারী এবং দীর্ঘ নামায আদায়কারী ছিলেন আর অন্যদেরও নামাযের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। অভাবী ও বন্ধুদের সাহায্যকারী ছিলেন–এ কথা প্রত্যেকেই লিখেছে। কেউ যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করত তাহলে তাকেও নিষেধ করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পুস্তকের সাথে তাঁর প্রেমময় সম্পর্ক ছিল এবং মিটিংএ সেসব পুস্তকের নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তিনি ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টরও ছিলেন। ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনে তার সেক্রেটারী জনাব নাসের শামস সাহেব লিখেন, তিনি ২০১১ সালের শুরু থেকে ২০১৯ সালের শেষ পর্যন্ত ফযলে উমর ফাউণ্ডেশনের ডাইরেক্টর ছিলেন। বার্ধক্য ও দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের সকল মিটিং-এ নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। এক দশক পর্যন্ত তার দোয়া এবং যথাযথ পরামর্শ থেকে আমরা কল্যাণমণ্ডিত হয়েছি। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, মুত্তাকী এবং খিলাফতের প্রতি সত্যিকার অর্থে বিশ্বস্ত জামা'তের সেবক ছিলেন। তিনি বলেন, মরহুমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি তা হলো, তার আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং অত্যন্ত বিনয় ও বিগলনের সাথে নামায আদায় করা। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানাদিকেও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন।

তৃতীয় জানাযা হলো মুহাম্মদ দীন সাহেবের পুত্র ডাক্তার হামিদ উদ্দিন সাহেবের, যিনি ১২১ জিম বে লখ্খুওয়াল, ফয়সালাবাদ নিবাসী ছিলেন। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমের বংশে আহমদীয়াত গুরুদাসপুর জেলার ফার্সিয়া নিবাসী তার পিতা জনাব মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব এবং দাদা জনাব ফতেহ উদ্দিন সাহেবের একত্রে বয়আতের কল্যাণে এসেছিল, যারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে বয়আত করেছিলেন। মরহুমের জন্ম কাদিয়ানে হয়েছিল। তার মাতার আপন চাচা হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব কাদিয়ানী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তিনি খ্রিষ্টধর্মের বিখ্যাত আলেম ছিলেন এবং দীর্ঘকাল কাদিয়ানের মাদরাসা

আহমদীয়ার শিক্ষকও ছিলেন। ভারত বিভাগের পর মরহুমের পরিবার ফয়সালাবাদে এসে বসতি স্থাপন করে। পেশাগত দিক দিয়ে মরহুম ডিসপেন্সার ছিলেন যার কল্যানে তিনি পুরো এলাকায় মানবতার সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। অভাবীদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান করতেন। অত্যন্ত সরল মনের অধিকারী, খোদাভীরু, শৈশব থেকেই নিয়মিত নামায-রোজায় অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র নিদর্শনাবলীর সম্মান করতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী, পরম স্নেহশীল ও আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসাকারী একজন ঈমানদার ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। কখনো কাউকে কোন বিষয়ে না বলতেন না। তিনি সবার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং সকলের উপকার সাধনের চেষ্টা করতেন। জামা'তের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেছেন। তার এক ছেলে করীমুদ্দীন শামস সাহেব মুরব্বী সিলসিলা, বর্তমানে তানজানিয়াতে কর্মরত আছেন। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততার কারণে তিনি মরহুমের জানাযার নামাযে অংশ নিতে পারেননি। তার এক জামাতা মুরব্বী সিলসিলা এবং আরেক জামাতা জামা'তের মুয়াল্লিম হিসাবে সেবারত আছেন। তার এক দৌহিত্র জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় শাহেদ ক্লাসের ছাত্র। অনুরূপভাবে তার বেশ কয়েকজন পৌত্র পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রী ওয়াকফে নও এর বরকতময় তাহরীকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার বংশধরদেরও বিশ্বস্ততার সাথে বয়আতের অঙ্গীকার পালনের তৌফিক দান করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।